Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 184 – 190
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

'আম্মা' : কাকমারা জাতির জীবন ও সংগ্রাম

ড. কৃষ্ণ কুমার সরকার
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
রাজা নরেন্দ্র লাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত)
গোপ প্রাঙ্গণ, পশ্চিম মেদিনীপুর
Email ID : krishnakumarsarkar08@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword

Amma, Kakmara Community, Life Struggle, Wandering Condition, Identity.

Abstract

'Amma' is one of the best short stories of Sushil Jana (1916-2008). The story was first published in 1953. In this story, the storyteller has manifested his view on the life struggle of a wandering community of Medinipur called Kakmara. Literature is the mirror of social life. It is indeed expressed in this short story. Sushil Jana was born and brought up in Medinipur town. So he had witnessed many Kakmara families in his own life. They used to spend their life by *begging* from wandering conditions. 'Amma' is the subject of the story so he has highlighted their lives in this short story. In the discussion article, an attempt has been made to highlight the identity of the Kakmara community and the narrative of their life struggle as described in the story of 'Amma'.

Discussion

ভূমিকা : কথাসাহিত্যিক সুশীল জানা (১৯১৬-২০০৮) বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে অপরিচিত নন। তিনি ছিলেন একজন বাঙালি সাহিত্যিক, ছোটগল্পকার ও সম্পাদক।[১] সুশীল জানা সম্ভ্রান্ত কৃষক পরিবারের সন্তান। প্রাথমিক জীবন মেদিনীপুরে কাটলেও পরে তিনি চলে আসেন কলকাতায়। তাঁর লিখিত প্রথম গল্প প্রকাশ হয় 'উত্তরা' ও 'প্রবাসী' পত্রিকায়। ১৯৪৬ সালে মুজফ্ফর আহ্‌মদের ডাকে যোগ দেন ন্যাশনাল বুক এজেন্সিতে। তিনি বামপন্থী মনোভাবাপন্ন ছিলেন ও প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। তেভাগা কৃষক আন্দোলনের ওপরে লেখা তাঁর ছোটগল্প সমাদৃত হয়েছে।[২] ১৯৫০ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত মুরলীধর গার্লস কলেজে শিক্ষকতা করেছেন। সুদীর্ঘ ৪০ বছরের সাহিত্য জীবনে তিনি লিখেছেন ৬টি উপন্যাস[৩] (মহানগরী, সূর্যগ্রাস, বেলাভূমির গান, সাগর সঙ্গমে, শতদ্রুর সংখ্যা, প্রস্থান পর্ব), ছোটগল্প, কবিতা এবং বহু প্রবন্ধ। জীবনের অভিজ্ঞান অজস্র বৈচিত্র্য নিয়ে কিভাবে বাগ্ময় হয়ে উঠেছে সুশীল জানার লেখায়, তাঁর সাক্ষ্য দেয় তাঁর সমস্ত রচনাগুলি। সুশীল জানা বঙ্কিম পুরস্কার, ও শরৎচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত হন। সুশীল জানা নিজে একজন অনুবাদক ছিলেন ও তাঁর লেখা অনূদিত হয়েছে বিভিন্ন বিদেশি ভাষায়।[৪]

তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়গুলিকে তার রচনায় স্থান দিতেন। কাকমারা জাতি তথা কাকমারা পরিবারের জীবন সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে তাঁর লেখা অন্যতম ছোটগল্প হল আম্মা।[৫] আম্মা গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র আন্দি। তাকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে আরো কয়েকটি চরিত্র। আন্দি কাকমারা জাতির মেয়ে। ভালোবেসে বিয়ে করেছিল সচ্চাষী জগা পাইককে। ফলে দুজনই পরিত্যক্ত হয়েছিল স্ব-স্ব সমাজ থেকে। নতুন চড়ে তারা জীবন কাটাতে শুরু করে। সেখানে পড়ে কুচক্রী গোবিন্দ তশীলদারের নজর। জগার অকাল মৃত্যুর পর আন্দি কিভাবে তার বসত ভিটে ও চাষযোগ্য জমি আগলে রাখতে পারবে তাই নিয়েই এই গল্প। একদিকে আন্দি যেমন তিন সন্তানের জননী, তেমনি সে আবাদ করা জমিগুলিরও জননী। সে যেন তাদের মা— 'আম্মা'। কিন্তু বর্ণহিন্দু গোবিন্দ চক্কোত্তি সুকৌশলে তার জমিজমা হাতিয়ে নিতে চায়। আন্দি ভ্রাম্যমান কাকমারা জাতির মেয়ে। সে জানে লড়াই কিভাবে করতে হয়। এখন সে তিন সন্তানের জননী। কোনভাবেই সে এজমির ওপর তার অধিকার ছাড়বে না। আন্দির জীবনের আনুপূর্বিক ঘটনাপ্রবাহই এই গল্পের প্রধান বিষয়বস্তু। আন্দির সাথে কাকমারা জাতির অনুষঙ্গ জড়িত। তাই এই আখ্যানের মধ্যদিয়ে আমরা কাকমারা পরিবারের জীবন সংগ্রামের চিত্র পাবো। বর্তমান প্রবন্ধে কাকমারা জাতির পরিচয় সহ গল্পে বর্ণিত তাদের জীবন সংগ্রামের কাহিনীই তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

কাকমারাদের পরিচয় : কাকমারারা একটি যাযাবর গোষ্ঠী। মূলত খাদ্যসংগ্রহের কারণে তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিচরণ করে। এদের দেখতে পাওয়া যায় মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পূর্ব সমতলে কাঁথি, তমলুক মহাকুমার বিভিন্ন স্থানে। এদের এখনো ২৫০-৩০০ পরিবারের অস্তিত্ব দেখা যায়। এদের জীবন যাত্রায় বিভিন্ন কৌতূহলোদ্দীপক আচরণের অনুপ্রবেশ দেখা যায়। এরা শ্মশানে ফেলে-দেওয়া হাঁড়ি-কলসী কুড়িয়ে নিজেদের রান্নার কাজে ব্যবহার করে, মড়াপোড়ানো অর্দ্ধদগ্ধ কাঠও দৈনন্দিন কাজের জন্য ব্যবহার করে। এদের নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান থাকে না। তবে তারা অস্থায়ী আস্তানা গড়ে তোলে। এখানে অক্ষম সদস্যরা ও শিশুরা আশ্রয় নিয়ে থাকে। এই অস্থায়ী আস্তানাতে চলমান কাকমারারা বছরের কোন না কোন সময়ে ফিরে আসে। এই ক্রমচলিষ্ণুতা তাদের এক যাযাবর গোষ্ঠীতে পরিণত করেছে।

কাকমারারা নিজেদের মধ্যে ভাঙ্গা তেলেগুতে কথা বলেন। তবে স্থানীয়দের মধ্যে তারা ভাঙ্গা বাংলাতেও কথা বলেন। **১৯৫১** সালের আদমসুমারিতে 'মাদ্রাজী' হিসেবে এরা নিজেদের পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। যাযাবর হওয়ার কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এদের মধ্যে সমাজ বন্ধন বেশ শিথিল। সাধারণত বাজারের কাছে, বা কোন মেলার ধারে বা বড় গাছের নীচে বা কোন পুষ্করনীর পাড়ে এরা নিজেদের আস্তানা গড়ে তোলে। কেমন উপার্জন হচ্ছে তার পরিমানের উপর নির্ভর করে তারা সেখানে থাকার সময় সীমা নির্ধারণ করে। সাধারণত একনাগাড়ে দশ থেকে তিরিশ দিন পর্যন্ত তারা একস্থানে থকেন। ভিক্ষাবৃত্তিই এদের প্রধান উপার্জনের উৎস। তবে এই উপার্জন নির্ভর করে স্থানীয় অর্থনীতির সমৃদ্ধির উপর। কারণ কৃষি নির্ভর গ্রাম যদি সমৃদ্ধিশালী হয়, তবে তাদের ভিক্ষাও সেখানে ভালোভাবেই হয়, আর তারা সেখানে বেশিদিন থাকতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

কাকমারারা অনেক সময় পরিত্যক্ত দোকানঘর বা বন্ধ থাকা স্কুল বাড়ির খালি ঘর দু-এক রাতের তাৎক্ষণিক আবাস হিসাবে ব্যবহার করেন। গাছতলায় থাকার সময় গাছের উঁচু ডালে কাকমারারা তাদের বিছানাপত্র রেখে দেয়। এর পাশাপাশি তারা অন্যান্য তৈজসপত্রও ঝুলিয়ে রাখে। যদিও তারা যাযাবর বৃত্তির মাধ্যমে ভ্রমণান্তে জীবিকা সম্পন্ন করেন তবুও মেদিনীপুরের কোন কোন অঞ্চলে তাদের আধাস্থায়ী বাসস্থান দেখা যায়। এখানে মূলত তাদের পরিবারের বয়ঃজ্যেষ্ঠ্যরা ও শিশুরা আশ্রয় নেয়। একটু সুস্থ হলেই তারা আবার যাযাবরের মত দলবেঁধে ঘুরে বেড়ায়। প্রবোধ কুমার ভৌমিক জানিয়ছেন, 'কাঁথি, তমলুক এবং সদর মহাকুমার নানা জায়গা এই যাযাবরদের প্রধান বিচরণ ভূমি। প্রতিবেশি রাজ্য ওড়িষ্যার বালেশ্বর ও পুরী জেলাতেও এদের ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। তিনি আরো জানিয়েছেন, 'এই কাকমারারা আজ প্রায় দুশো বছর মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় নিজেদের মৌল বৈশিষ্টের অনেকখানিই হারিয়ে বসে আছে।'

তিনি মেদিনীপুর জেলার কাঁথি ও তমলুক মহাকুমার বিভিন্ন এলাকার প্রায় ৫০টি কাকমারা পরিবারের উল্লেখ করেছেন।[৬] তবে ইদানিংকালে কাকমারারা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আগ্রহী হয়েছেন।

আখ্যানে বর্ণিত কাকামারাদের জীবন ও সংগ্রাম : সুশীল জানা মেদিনীপুরের এক কাকমারা পরিবারের জীবন কাহিনীর ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছেন তার আখ্যানে। 'আম্মা' গল্পে ভ্রাম্যমান একটি কাকমারা পরিবারের পরিচয় আমরা পাই। গল্পের শুরুটা হচ্ছে ভ্রাম্যমান কাকমারা জাতির একটি দলের এক স্থান থেকে অন্য আজানা স্থানে পাড়ি দেওয়ার উদ্দেশ্যে -

> "দলের রাতকানা লোকটা জিজ্ঞেস করলে, "আর কত্‌টা পথ হে?
>
> 'হেঃ—রাত দু-পহর ত্‌ক হাঁট শালা এখন—তারপর হাট-চালায় যেয়ে মাথা গুঁজবি।' পাশের জোয়ান মতো ছোকরাটি বললে, 'হাঁট এখন মুখ বুজে।'
>
> কিন্তু মুখ বুজে থাকা তার পক্ষে কঠিন—হোঁচট খাচ্ছে সে পায়, যদিও হাত ধরে চলেছে একজনের। বকে মরছে বিড় বিড় ক'রে। দলের আর সবাই চুপ। মাথায় কাঁধে মোট—পিঠে বোঁচকা, কোন মেয়ের ভোঁচকায় ঘুমন্ত শিশু। দলটিতে প্রায় মেয়ে মরদ ক'রে জনা দশেক হবে— চলেছে কোন নতুন হাট-খোলার উদ্দেশে পুরান কোন হাট-খোলা ছেড়ে। মাথায় পিঠে কাঁধে বয়ে নিয়ে চলেছে ঘর-সংসার-হাঁড়িকুড়ি কাঁথা চ্যাটাই— মায় টঙ বাঁধার বাঁশ-বাখারিটি পর্যন্ত।
>
> জাতে ওদের বলে 'কাকমারা'— কোন্ বুনো পূজোর পদ্ধতিতে কাক ধরে ধরে বলি দেয়, কাকের মাংস খায় পরম তৃপ্তিতে।..."[৭]

কাকমারা বেদের মতো ঘুড়ে বেড়ায় এক গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। তারা অস্থায়ী বাসস্থান গড়ে তোলেন হাট-চালার আশেপাশে। এটাই তাদের জীবন ধারণের স্বাভাবিক রীতি। তাদের পোশাক পরিচ্ছদ অদ্ভুদ ধরণের। মূলস্রোতের অধিবাসীদের কাছে সেগুলি আকর্ষণের সাথে সাথে যথেষ্ঠ বিস্ময়ের উদ্রেক করে। তারা গলায় লাল নীল কাঁচের মালা পরিধান করেন। কাকমারা জাতির পুরুষ সদস্যরা পাখি শিকার করে, ভেলিক ভোজবাজী দেখায়। মেয়েরা ঝুড়িতে করে সস্তা দামের সাবান, তেল, আয়না ইত্যাদি বাড়ি বাড়ি ফেরি করে বিক্রি করে। যখন কোন স্থানে এগুলি তারা সহজে বিক্রি করতে পারে তাহলে তারা সেখানে অস্থায়ী আস্তানা গড়ে তোলে। এক্ষেত্রে তারা নিজেরা টঙ বাঁধে হাট-খোলার আশপাশেই। তাদের প্রকৃত মাতৃভাষা তেলেগু। কিন্তু বহুবছর আগেই তারা বাস্তুচ্যুত হয়েছে বলে অনর্গলে স্থানীয় বাংলা ভাষা বলতে পারে। তারা কবে তাদের মাতৃভূমি থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে এসেছিল তার সঠিক দিনক্ষণ জানা যায় না। তারা মূলত দল বেধে ঘুরে বেড়ায় দক্ষিন-পশ্চিম বাংলার সীমান্তের অঞ্চল থেকে অঞ্চলে। সুশীল জানা এরকম কাকমারা পরিবারের স্থানান্তরের বর্ণনা দিয়েই গল্পের ভিত রচনা করেছেন।

গল্পে বর্ণিত কাকমারা দলের প্রধান সর্দার বৃদ্ধ বাগাম্বর। দলের যুবা, বৃদ্ধ, আবাল-বণিতা সকলে তার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। রাতকানা গোবনার অসহায়তার কথা ভেবে দলপতি বাগাম্বর সিদ্ধান্ত নেয় ঐ স্থানের পাশের গ্রামেই তারা থাকবেন। যেখানে তাদের জাতের এক বেটির (আন্দির) ঘর-সংসার। দলের অন্য সদ্যস্যদের প্রশ্নের উত্তরে বাগম্বরের বিবৃতির মাধ্যমে আমরা আন্দির পূর্বকালের পরিচয় পায় -

> "....মোদের জাতের মেয়া। দল ছেড়ে চলে গেল একদিন সে একটা উদো চাষীর সঙ্গে। তার ঘর এই জালপাই মহালে।' বাগাম্বরই বললে, 'জমিন গোরু ছাগল হাঁস মুরগী—ঘরদোর সব জমজমাট। মেয়েটা মোদের ভারী পয়মন্ত কি—না।
>
> 'কে বল দিকিন।'
>
> 'আন্দি। মোর এক স্যাঙাতের বেটি। চিনবেনি তোমরা"[৮]

বাগাম্বরেরে নেতৃত্বে এই ভ্রাম্যমান দলটি আন্দির বাড়ি আশ্রয় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সেখানে রাত্রি যাপনে যে ভুরিভোজ হবে তার ইঙ্গিত পেয়ে সকলে দ্রুত গন্তব্যের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। এমনকি রাতকান গোবনার পর্যন্ত হাঁটার গতি বৃদ্ধি পায়। পথে পরিত্যক্ত শ্মশান থেকে তারা হাঁড়ি তুলে নেয়। গল্পকার তাদের জীবনের বর্ণনায় লিখছেন -

> "শ্মশানের মড়া ফেলা হাঁড়ি কলসীর জন্যে ওদের ঘৃণাও নেই - ভয় সংকোচও নেই। তাইতে গুষ্টিশুদ্ধ রাঁধে-বাড়ে খায় আর গাছ তলায় শোয়। ঘুরে ঘুরে বেড়ায় তল্লাটে থেকে তল্লাটে। মরে আর জন্মায় বংশ পরম্পরায়। এই ওদের জীবন।"[৯]

তবে তাদের চিরাচরিত জীবনের মধ্যে ব্যতিক্রম জীবন পেয়েছেন আন্দি। যিনি এই গল্পের 'নাম' ভূমিকায়। তিনিই আম্মা। উদো চাষী জগার বিধবা। তিনটে নাবালক ছেলে রেখে সাপের কামড়ে প্রাণ গেছে জগার। কিন্তু তার সে জমি জায়গা অটুট আছে আন্দির কাছেই। আন্দি মেয়ে হয়েও বলদ হাঁকিয়ে নিজেই সে চাষ-আবাদ করে একটা জোয়ান মরদের মত। আখ্যানে তার পরিচয় আমরা পাচ্ছি এই ভাবে -

> "তিন ছেলের মা কিন্তু এখনও সে ভরাযৌবনা, বেদের মেয়ের নির্ভীকতার সঙ্গে মিশেছে কিসান বউয়ের লক্ষ্মীশ্রী। ঝকঝক তক্‌তক্ করছে ঘরদোর উঠোন দাওয়া।"[১০]

বাগাম্বরের বুনো কাকমারার দল আন্দির উঠোনের সামনে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করলে আন্দি তাদের সাজ পোশাক দেখে বুজতে পারে কারা এসেছে তার অতিথি হয়ে। আন্দি ঝাঁটা দিয়ে তাঁদের বিদায় করতে চাইলে বাগাম্বর জানায় তারা শুধু ঐ রাতটুকু থেকেই চলে যাবে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় তারা আন্দির দাওয়ায় পড়ে থাকবে। ভাত পাবে না, খাবার হিসেবে মুড়ি পাবে তারা। আর একটা বিধান দেয় আন্দি -

> "রাত থাকতে পালাতে পাবে না কেউ—যাওয়ার সময় ঝোলাঝুলি সব খুলে দেখিয়ে যেতে হবে আন্দিকে। হাঁস মুরগীর একোটা কোন কিছুতে হাত দেবেত বেধড়ক্কা ঝাঁটা খাবে সবাই। মাথা দুলিয়ে তাতে সায় দিল বাগাম্বর।"[১১]

আন্দি নিজে কাকমারা জাতির মেয়ে হয়েও কাকামারাদের প্রতি তার সহানুভূতি কাজ করে নি। এখন সে পুরো দস্তুর কিসান বধু, কিসান জননী। জগার অবর্তমানে এই জমি জায়গা দখল রাখাই তার প্রধান কাজ। কারণ তার এই জমিতে নজর পড়েছে গোবিন্দ তশীলদারের। আন্দির এই জমি দখলের লড়াইয়ে একমাত্র তার সঙ্গে আছে মাগন মণ্ডল। সে এসে আন্দিকে জানায় তশীলদার ঘুষ দিয়ে জরিপ সাহেব ও আমিনকে হাত করে ফেলেছে। –

> "মাগন বললে, হল না কিছুই—শালা তশীলদার জরিপ-সাহেবকে একেবারে হাতই করে ফেলেছে, মায় আমিন পর্যন্ত।'
>
> আন্দি প্রায় দমবন্ধ করে জিজ্ঞাসা করল, 'জরিপ সাহেব কি বলে?'
>
> 'বলবে আর কি –যা করবার তাই করলে।' মাগন বলল, 'জগার সব জমি – মায় ভিটে পর্যন্ত খাস হয়ে গেল জমিদারের নামে। জগার কোনো ওয়ারিশ নাই—এই কথা মেনে নিল জরিপ সাহেব।"[১২]

আন্দি প্রশ্ন তোলে তার তিন তিনটে ছেলে আর সে তাহলে কোথায় যাবে? তার মনে হয় মাগন সব কিছু বুঝিয়ে বলতে পারে নি। সে বার বার প্রশ্ন তোলে -

> "বলেছ সব? বলেছ, কেমন করে আবাদ করেছিলাম চর, কেমন করে গতর দিয়ে করেছিলাম একে সোনার মাটি। বলেছ? –মোর মনে হয় বুঝিয়ে বলতে পারোনি সব।"[১৩]

আন্দি নিজের স্বামীর তৈরি আবাদী জমি ঘরদোর কিভাবে রক্ষা করবে কুচক্রী তশীলদারের হাত থেকে এই কথা চিন্তা করতে থাকে রাত্রি জেগে। ইতিমধ্যে ভোর হয়ে আসে। বাগাম্বরের দল তল্পিতল্পা বেঁধে যাওয়ার তোড়জোর শুরু করে দেয়। কিন্তু আন্দি ওদের দেখে বলে ওঠে 'ঝোলাঝুলি না দেখিয়ে যাচ্ছা যে বড় সব!' এই অংশের বর্ণনা —

> "হকচকিয়ে তাকাল সবাই। দেখতে দেখতে বিভ্রাট বেধে গেল একটা। এর ওর ঝোলাঝুলি থেকে কক্ কক্ করে উড়ে বেরিয়ে এল মুরগীর বাচ্চা, কার কাপড়ের তলা থেকে প্যাঁক প্যাঁক করে উঠল ধাড়ি হাঁস। গোব্‌না বিপদ বুঝে ঝোলা চেপে বসে পড়ল মাটিতে— মড় মড় করে ভেঙে গেল ডিমের কাঁড়ি, উঠোন ভেসে গেল ভাঙা ডিমের কুসুমে। রাত-কানা বেচারী অন্ধকারে হাঁস মুরগী ধরতে পারেনি— হাতড়ে কিছু ডিম সটকেছিল ঝোলায়। কাঠ মেরে দাঁড়াল বুড়ো বাগাম্বর। আন্দির হাতে ঘন ঘন ঝাঁটার আস্ফালন।"[১৪]

আন্দি কাকমারাদের স্বভাব জানতো। তারা একটু হাতচোরা গোছের। আসলে অভাব তাদের নিত্যসঙ্গী। তাই অনেকসময় তারা খাদ্যসামগ্রী দেখলে লোভ সংবরবণ করতে পারেন না। ভালোমন্দ, হিতাহিত জ্ঞান তারা হারিয়ে ফেলেন।

শেষ পর্যন্ত মুখ বুজে অনেক গালাগালি হজম করে, নাকে খৎ দিয়ে বাগাম্বরের দল আন্দির বাড়ি থেকে অন্য গন্তব্যের দিকে রওনা দেয়। শ্মশান পেরিয়ে একটা বাঁক নিতেই দলটা এসে পড়ে একেবারে মালিকের কাছারি বাড়ির কাছে। গোবিন্দ তশীলদার তাদের দেখে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলো এবং তাদের এই চড়ে ডেরা বাঁধার আমন্ত্রণ জানালো। কিন্তু বাগাম্বর একগাল হেসে মাথা নেড়ে বললে,

> "বেটি কুটুমের ঘরের কাছে থাকলে মোদের কি আর ইজ্জৎ থাকবে হুজুর। বাগাম্বরের কাছে সেটি হবে না কখনো। এই মোরা চলে যাচ্ছি।"[১৫]

কিন্তু গোবিন্দ তশীলদার তাদের ছাড়বার পাত্র নন। তিনি কৌশলে তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন তার কাছারির অতিথ্শালায় –

> "ভোজের হৈ চৈ পড়ে গেল কাছারি বাড়িতে। তিন তিনটে চাকর ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিলে গোবিন্দ চক্কোত্তির ফরমাসে। পুকুরে পড়ল জাল, গাঁজা এলো ভরি ভরি, নিজে তদারক করতে লাগল গোবিন্দ। কাকমারার দল দিব্যি বসে বসে খেতে লাগল শুধু একদিন নয়– পুরো দুটো দিন। চরের চাষাভুসোরা অবাক হল প্রথমে– তারপর কানাঘুষো করতে লাগলো এই বলে, 'ও আর কিছু লয়– দলে চেংড়ি যুবতী আছে কটা, তশীলদারের নজর পড়েছে সেই দিকে। শালা চরে এবার কাকমারা বসাবে গো'।"[১৬]

বাগাম্বর ভাবতে থাকে এত খাতির যত্ন সবই তাদের 'পয়মন্ত বেটি' আন্দির কারনেই। কিন্তু গোবিন্দ তশীলদারের মতলব ছিল অন্য। তিনি কাকমারাদের নিজের দলে রেখে আন্দির বিপরীতে তাদেরকে স্বাক্ষ্য হিসেবে কাজে লাগাতে চান। সেই অনুযায়ী হাকিমের সামনে মাগন যখন আন্দিকে 'জগার বউ' বলে পরিচয় দিলেন তখন তিনি আন্দিকে 'জগার রক্ষিতা' বলে পরিচয় দিলেন। হাকিম আন্দিকে জগার সাথে তার বিয়ে হয়েছিল কিনা জিজ্ঞাসা করলে গোবিন্দ রসিকতার সুরে বলেন,

> "কাকমারা মাগীর সঙ্গে সচ্চাষীর বিয়ে সাদি হুজুর।' আন্দি অবাক হতে লাগলো। সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই গোবিন্দ তার চাকরকে দিয়ে ডেকে পাঠায় বাগাম্বরকে। বাগাম্বর কাকমারাদের অদ্ভুদ সুসজ্জিত পোশাক পরিধান করে এসে হাজির হয়। মাথায় কাকের পালক গোঁজা, লাল শালুর পাগড়ী, গলায় লাল নীল কাঁচের মালা, হাতে লোহার বালা আর কানে কুন্ডুল। গোবিন্দ তাকে দেখিয়ে হাকিমকে বললে, 'ওকেই জিজ্ঞেস করুন হুজুর। ওদেরি জাত।' হাকিম আন্দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেসে করলে, 'ওকে তুমি চেন?' বাগাম্বর আভূমি সেলাম করে বললে, "হাঁ হুজুর—মোদের বেটি, খুব পয়মন্ত বেটি।"[১৭]

এরপর গোবিন্দ চিত্রনাট্য অনুযায়ী হাকিমকে জানায় কিভাবে জগা এই কাকমারা মেয়েকে নিয়ে চরে এসে ঘর বেঁধেছিল, সেই সব কথা। শেষ বললে, 'এরকম একছার হয়হুজুর। উদো চাষাভূসো যেমন ফাঁদে পড়ে তেমন ও মাগীরাও একটা থেকে আর একটার কাঁধে চাপে। সব বেশ্যার সামিল।' আন্দি তীব্র প্রতিবাদ করে। কিন্তু গোবিন্দ তার নিজের কর্মচারী হারাধনকে দিয়ে স্বীকারোক্তি করায় যে জগা মরে যাওয়ার দুমাস পর থেকেই আন্দির সাথে তার সম্পর্ক। আন্দি এসব শুনে কোলের ছেলেটাকে নামিয়ে ছুটে গেল হারাধনের দিকে। এক লহমায় গিয়ে চেপে ধরল তার গলা -

> "হারামির বাচ্চা।' —
> হৈ-চৈ করে উঠল গোবিন্দ। হারাধন চেঁচাতে লাগলো প্রাণপণে। ছুটে এল পেয়াদারা। ধরাধরি করে ছাড়িয়ে দিল হারাধনকে। বোকার মতো খাপছাড়া ভাবে হাকিমের দিকে চেয়ে আবার চিৎকার করে উঠল আন্দি নিজের তিনটে ছেলের দিকে আঙুল দেখিয়ে, 'ওরা মোর ব্যাটা-হোই দ্যাখ অবোধ বালকরা মোর। ওরা পাবে না তার বাপের হাঁসিল করা জমিন! বল—বল—আমি ওদের আম্মা! বল মোকে'—
> গোবিন্দ ভেংচি কেটে বলল, 'রক্ষিতার বাচ্চা, সে আবার ওয়ারিশ! তোর জাতের দল বসে আছে হোই বাইরে—চলে যা তাদের সঙ্গে।'
> 'তোকে মেরে ফেলাব—মেরে ফেলাব হারামি'—গর্জেও উঠে ছুটে গেল আন্দি গোবিন্দের দিকে।
> গোবিন্দ টপ্ করে লাফ দিয়ে হুজুরের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'দেখুন জুজুর—ছোট জাতের স্বভাব। বেদিনী হারামজাদী সাক্ষাৎ চামুণ্ডা হুজুর।'
> 'তোর ভদ্দরলোকের মুখে মারি লাথ!"[১৮]

এরকম প্রেক্ষাপটে আন্দির কঁড়েতে আগুন লাগিয়ে দেয় কে বা কারা। কিন্তু পাঠকদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না এখানেও সেই উচ্চবর্গীয় শোষক গোবিন্দ তশীলদারের হাত আছে। তার অঙ্গুলিহেলনেই ঘটছে সব। চাষীর কুঁড়ে। পুড়ে শেষ হতে আর কতক্ষণই বা লাগে। দেখতে দেখতে চারদিক থেকে আগুন ধরে জ্বলে শেষ হয়ে গেল। কেরোসিন তেল চুম্বকের মত টেনে নিল আগুনকে। দড়ি ছিঁড়ে গরুগুলো পালালো কোথায় বনে বাদাড়ে, দম বন্ধ হয়ে মরে গেল কটা ছাগল, পুড়ে মরে গেল প্রায় সব হাঁস মুরগীগুলো। সেই ছাই ভস্মের পাশে তিনটে ছেলেকে নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে রইল আন্দি।

ঘটনার গভীরতা না বুঝে বুড়ো বাগাম্বর আন্দিকে সান্তনা দিয়ে বলে, 'ও সব ঝুটমুটের জন্যে দুখ্ করিসনি বেটি! মোরা কাকমারার জাত! ওরা যখন তাড়াবেই তো চল মোদের সঙ্গে। দল বসে আছে তোর জন্যে। কেউ যাইনি মোরা—চল।' [১৯]

কিন্তু আন্দি সেই নোংড়া ছেঁড়া জীবনে আর ফিরে যেতে চাইলো না। সে মনে মনে সংকল্প করলো যতই বাধা বিপত্তি আসুক না কেন সে তার ভিটে ছেড়ে কোথাও যাবে না। তাই মাগন যখন আন্দির একটা হাত চেপে ধরে বললে,

> ''চল আন্দি—সরে চ'— আর এক দণ্ড হেথা লয়।'
> 'না।' —
> হঠাৎ ফেটে পড়া একটা সবল কণ্ঠ নিস্তরঙ্গ মরা অন্ধকারকে যেন আলোড়িত কম্পিত করে তোলে মুহূর্তে,
> 'আসুক কে লড়াবে মোকে।'
> তিনটে ছেলেকে ঘিরে অটোল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল আন্দি — নড়ল না এক পা।
> একটা রাঙা আভা ঝলমল করছে অন্ধকারে — সেটা যেন নিভন্ত খড়কুটোর নয়, সে ঐ বাঘিনী মেয়েটার রাঙা চোখের আগুন, ওর সর্বাঙ্গের ক্রুদ্ধ দ্যুতি।''[২০]

চলচিত্রে কাকমারা জীবন : আন্দির জীবনের এই কাহিনী নিয়েই পরিচালক গৌতম ঘোষ **১৯৮১** তে নির্মাণ করলেন দখল চলচিত্রটি।[২১] আন্দি চরিত্রে রূপদান করেছিলেন মমতা শঙ্কর।[২২] আন্দি (মমতাশঙ্কর) যাযাবর, হতদরিদ্র কাকমারা সম্প্রদায়ের এক মেয়ে, ভালোবেসে বিয়ে করে উঁচুজাতের জগা পাইককে। সম্প্রদায় তাদের একঘরে করে দেয়। তাদের শ্রম দিয়ে চরা জমিকে তারা পরিণত করে চাষযোগ্য, উর্বর জমিতে। কাকমারা'রা একদিন তাদের দল (সুনীল মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য) নিয়ে আসে আন্দি'র বাড়িতে। কিন্তু আন্দি দেখে তাদের স্বভাব বদলায়নি, তাই তাড়িয়ে দেয় ওদের। গ্রামের জমিদার তার খাজনা আদায়কারী গোবিন্দ'র (বিমল দেব) সহযোগিতায় আন্দি'র জমি দখল করার চেষ্টা করে। গোবিন্দ'র লোকেরা আন্দি'র বাড়িতে আগুনও লাগিয়ে দেয়। এবার, কাকমারা সম্প্রদায়ের মানুষরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আন্দি'র পাশে থাকতে চায়। কিন্তু আন্দি একাই জমির লড়াইয়ের কথা বলে। এই ঘটনা নিয়েই নির্মিত দখল চলচিত্র।[২৩] ভ্রাম্যমান কাকমারা জীবনের সংগ্রাম নিয়ে নির্মিত এই চলচ্চিত্রটি স্বর্ণকমল পুরষ্কার লাভ করে।

পর্যবেক্ষণ : সবশেষে আমরা বলতে পারি কাকমারারা ভ্রাম্যমান যাযাবর বৃত্তির মানুষ। মূলত খ্যাদ্যান্বেষণের জন্য তারা একস্থান থেকে অন্যস্থানে পরিভ্রমণ করে বেড়ান। সাথে তারা কিছু বিনোদন উপযোগী ক্রিয়াকলাপ করেন। তাদের নিয়ে রচিত প্রথম আখ্যান আম্মা গল্পেও আমরা সেই প্রতিচ্ছবি পেয়েছি। যেখানে কাকমারাদের জীবন-যাপনের রীতি, তাদের স্বভাব, পোশাক পরিচ্ছদের শৈলী, তাদের খ্যাদ্যাভাষ সবকিছুই আমাদের কাছে পরিজ্ঞাত হয়েছে। যদিও কাকমারাদের আজ আর সেইভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে তারা এখনো আছেন মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে। এখন অতিমারি পরবর্তী সময়ে তারা তাদের জীবন যাপন শৈলী পরিবর্তন করে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে চাইছেন। কিন্তু সেখানেও তাদের কপালে জুটছে রাষ্ট্রীয় অবহেলা। তাদেরকে মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারী কোন পদক্ষপে গৃহীত হচ্ছে না। যারা জীবন পরিবর্তন করে বসবাস করতে চাইছেন তাদেরও অবস্থা হচ্ছে আম্মা আন্দির

মতোই। কাজেই কাকমারাদের সাধারণ অধিবাসী হিসেবে গ্রহণ করতে আমাদের সকলের সদ্‌ইচ্ছা ও ইতিবাচক মানসিকতা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী।

Reference :

১. বসু, অঞ্জলি, (সম্পাদিত), সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০১৯, পৃ. ৪৬৫
২. দাশ, সুস্নাত, (সম্পাদিত), তেভাগার গল্প, কলকাতা: প্রতিভাস, ১৯৯৮, পৃ. ৩১৪
৩. https://www.ekushshatak.com/product/sushil-jana-uponnas-samagra, access date: 10.05.2023
৪. https://www.anandabazar.com/west-bengal/kolkata/kolkatar-korcha-1.549353, access date: 10.05.2023
৫. সুশীল জানার শ্রেষ্ঠগল্প, কলকাতা: বুকমার্ক, ১৯৬৩, পৃ.পৃ. ১২৩-১৩৬
৬. ভৌমিক, প্রবোধ কুমার, 'কাকমারা', প্রণব রায় (সম্পা.), মেদিনীপুর : ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা: সাহিত্যলোক, পৃ.পৃ. ৪৩৭-৪৪৭
৭. সুশীল জানার শ্রেষ্ঠগল্প, কলকাতা : বুকমার্ক, ১৯৬৩, পৃ. ১২৩
৮. তদেব, পৃ. ১২৪
৯. তদেব, পৃ. ১২৫
১০. তদেব, পৃ. ১২৬
১১. তদেব, পৃ. ১২৭
১২. তদেব, পৃ. ১২৯
১৩. তদেব, পৃ. ১৩০
১৪. তদেব, পৃ. ১৩১
১৫. তদেব, পৃ. ১৩২
১৬. তদেব, পৃ. ১৩২
১৭. তদেব, পৃ. ১৩৩
১৮. তদেব, পৃ. ১৩৪
১৯. তদেব, পৃ. ১৩৫
২০. তদেব, পৃ. ১৩৬
২১. ঘোষ, গৌতম, দখল, ১৯৮১, https://www.youtube.com/watch?v=A3uWngNsx0o, access date: 10.05.2023
২২. শঙ্কর, মমতা, 'গৌতম ঘোষ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা', প্রাকাশিত, বিশেষ ক্রোড়পত্র-গৌতম ঘোষ, https://rritobak.blogspot.com/2021/07/blog-post_0.html, access date: 14.06.2023
২৩. Bengali Cinema Celebrating 100 Years, https://banglacinema100.com/moviedetails/VTJobmRVdzRkWGQwTkdWVlMwOXdiMW96TnpGc1p6MDk%3D, access date: 14.06.2023